Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 90–99
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের বিশ্বাস-সংস্কার, সংস্কৃতির রূপরেখা : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

সাগরিকা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
ইমেল : sagarikasaha111@gmail.com

Keyword
আদিবাসী, অন্ত্যজ, সংস্কৃতি, সংস্কার, কুসংস্কার।

Abstract
কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে গ্রামবাংলার আদিবাসী ও অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য শ্রেণীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনচর্যার সামগ্রিকরূপ পরিস্ফুট। এই প্রবন্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্থলপদ্ম', 'ডাইনীর বাঁশী', 'ডাইনী', 'নারী ও নাগিনী' 'সাপুড়ের গল্প', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'বাউল', 'ট্যারা', 'বরমলাগের মাঠ', 'প্রহ্লাদের কালী', 'চোর', 'পাটনী', 'মতিলাল', 'শবরী', 'বেদেনী' 'আকড়াইয়ের দীঘি' গল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের বিশ্বাস-সংস্কার, সংস্কৃতির যে চিত্র উদ্ভাসিত হয়, সেই বিষয়টিই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। গল্পগুলিতে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী ও আদিবাসী জনজীবনের সংস্কৃতি অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি, বাক্‌কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার, গান-নাচ, জীবিকা, খাদ্যাভাস, তাদের আইন-কানুন, প্রথার যে চিত্রণ প্রস্ফুট হয় তার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জনজীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকরূপ ও মানসগঠনটি সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। প্রত্যেক জাতির পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে, অস্তিত্বরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের যে রূপরেখা পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion
ভারতবর্ষের আদিবসবাসকারী মানবজাতিই আদিবাসী। আর্য-পূর্বভারতের আদিম বাসিন্দা যারা, তারাই আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি স্থাপনের পর নিজ বাসস্থান ছেড়ে আর্যদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেয়। ফলত আর্য সংস্কার-সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করতে পারেনি এবং আদিবাসীদের এক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। 'সংস্কৃতি' বা 'culture' একটি জাতি পরিচয়ের অন্যতম উপাদান। সংস্কৃতির স্বরূপ সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়। সংস্কৃতিই মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। তার মধ্যে দিয়েই মূল্যবোধ, নানান ধ্যান-ধারণা, সুদৃঢ় মন- মানসিকতার অধিকারি

হয় মানুষ। সংস্কৃতিই মানুষকে একটা পূর্ণ মানুষ এবং একটি জাতিকে আলাদা পরিচয় ও গঠন দেয়। সংস্কৃতি-সংস্কার এগুলো কোনোটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো বস্তু নয়। এই সংস্কৃতি-সংস্কার একটি অতি জটিল ধারণা। এই সংস্কৃতিই একটা জাতির স্বতন্ত্রতা তৈরি করে, বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এডওয়ার্ড টেইলর সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেন তা ধ্রুপদী সংজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত। সেই সংজ্ঞানুয়ায়ী মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্নকে বলে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হল সেই জটিল সামগ্রিকতা, যার অন্তর্গত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রাজনীতি, আচার এবং সামাজিক সদস্য হিসাবে একজন মানুষের দ্বারা অর্জিত অন্য যেকোনো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা অভ্যাস। এই সংস্কৃতিরই অন্তর্গত সংস্কার। সংস্কার থেকেই মানুষের মনে বিশ্বাস, কুসংস্কারের তৈরি হয়। সংস্কার থেকে নানান আচার- ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে করতে মানুষের মনে অনেক ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়। এই বিশ্বাস থেকে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ধারনা বা কুসংস্কার তৈরি হয়। আমাদের সমাজে যেমন নানা স্তর-বিভাজন রয়েছে, তেমনি সংস্কৃতিও বহু রঙে রাঙায়িত। উচ্চবর্ণ সমাজের হিন্দু সমাজ আর নিম্ন বর্ণের হিন্দু সমাজ অরথারত যারা অন্তজ তাদের সংস্কৃতি অনেক আলাদা। আবার আদিবাসীদের সাথে ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্তেও অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলমানদের অনেক সংসার এর মিল লক্ষণীয়। পৃথিবীর সমস্ত জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারনা-বিশ্বাস-সংস্কার বিদ্যমান। এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের নিরিখে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের বিশ্বাস, সংস্কার-সংস্কৃতির যে রূপরেখা পাওয়া যায় তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

আদিবাসী কারা? এই বিষয়ে প্রথমেই এক-দুলাইনে আলোচনা করেছি। অন্ত্যজ বলতে হিন্দুসমাজের একেবারে নিম্নজাতি বা নিম্নপেশার মানুষ যারা সমাজে ব্রাত্য তাদের কথা বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে আদিবাসী উপজাতি এবং সমাজে যারা অন্ত্যজ বা ব্রাত্য তাদের সংস্কৃতি-সংস্কার বিশ্বাস অর্থাৎ তাদের আচার, রীতি-নীতি, আইন-কানুন, নাচ-গান, পূজা-পার্বণ, খাদ্যাভাস, পোশাক-অলংকার, ভাষা ব্যবহার, জন্ম মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত নানান বৈচিত্র্য মণ্ডিত সংস্কৃতি-সংস্কারের যে উল্লেখ পাই সেই দিকটি আলোচনা করা হবে।

সংস্কার-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই একটা সমাজধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনই আদিবাসী সমাজে প্রথাগত রীতিনীতি পালন ও সেগুলো রক্ষণ এবং প্রয়োগের জন্য নিজস্ব আইন ও নির্বাচিত পঞ্চায়েত থাকে। এই পঞ্চায়েতের হাতে অনেক অলিখিত কঠিন শাস্তি পেতে হয়। এছাড়া এই সহজ গ্রামের মানুষদের মধ্যে কুসংস্কার যে কীরকম আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা তা আমরা গল্পগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখব। একটা জাতির সংস্কৃতি তার পারিপার্শ্বিক সবকিছুকে ঘিরে গড়ে ওঠে। তারাশঙ্করের অন্ত্যজ মানুষদের নিয়ে লেখা গল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখব একদিকে যেমন আদিবাসী ও অন্ত্যজ মানুষদের সংস্কার-সংস্কৃতির এক অনন্য রূপ, তেমনি এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটিও পরিস্ফুট। গল্পের অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের আচার-বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি এবং তাদের অন্দরমহলের নানান রঙের হাজার রামধনুর সত্তার হদিশ এবং তারাই এক রসময় বিশ্লেষণ রয়েছে এই প্রবন্ধে।

'স্থলপদ্ম' গল্পে সমাজের অন্ত্যজশ্রেণী বাউরিজীবনের নানান সামাজিক আচার বিশ্বাস- তাদের গান, ছড়া, সংস্কার-সংস্কৃতির পরিচয় বর্ণিত। গল্পের প্রথমেই পাওয়া যায় তাদের বাসস্থানের কথা, গ্রামের শেষে পায়রাখুপির মত চারিদিকে আবর্জনার মাঝে ছোট ছোট ঘর। তাদের গায়ের রংও কালিমাখা হাঁড়ির মত কালো। তাদের পোশাক ও সাজের বর্ণনায় দেখি মেয়েরা মাথায় খোঁপা বাঁধে, তাতে বেলকুড়ির মালা লাগায়, পরনে তাদের বাহার পাড় ময়লা শাড়ি। এছাড়া গল্পের মাঝেও আমরা পোশাক পরিচ্ছেদ অলংকারের বর্ণনা পাই- খুকী চরিত্রটির পরনে আধহাত চওড়া হাতী পাঞ্জাপেড়ে শাড়ী, হাতে একহাত সোনালী রেশমী চুড়ি, মাথায় লেবুতেল, নাকে সোনার নাকছাবি। গল্পে এই বর্ণনা থেকে অন্ত্যজ বাউরি শ্রেণীর বাসস্থান, তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ-অলংকার-সাজ সরঞ্জামের চিত্র পরিস্ফুট। এর পাশাপাশি বাউরি সমাজের মানুষের কিছু সংস্কারের কথাও গল্পে লিপিকৃত। বাউরি পাড়ায় কলেরা রোগের উপদ্রবের কারণ হিসাবে তারা বাবা নামুনের প্রভাবের কথা বিশ্বাস করে।তারা মা কালী ও মনসার পুজো দেওয়ার কথা বলে। এর পাশাপাশি তারা বিশ্বাস করে যে ঘরের কেউ সর্বপ্রথম কলেরায় মারা গেছে, সেই ঘরটি পুড়িয়ে দিলেই তবে কলেরা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মানুষের মনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারের দিকের ছবি এখানে ভীষণভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের ডাক্তার-বদ্যিতে কোনো বিশ্বাস নেই।

সমাজের এই প্রান্তিক মানুষগুলো যে কতটা অন্ধ-ভুল বিশ্বাসে নিমজ্জিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পের ছত্রে ছত্রে। এছাড়াও বাউরি পাড়ার প্রৌঢ়দের বিশ্বাস মাদুলি পরে শ্মশানে যেতে নেই। এছাড়াও বাউরিরা বিশ্বাস করে যদি কোনো রমনী মৃত পুত্র সন্তান নিয়ে শ্মশানে যায় তার আঁটকুড়া রোগ হয়। এছাড়াও কোন দোষ হয়ে গেলে 'মা-কালীর চরন্দক' অর্থাৎ চরণামৃত খেয়ে নিলে সমস্ত দোষ খন্ডে যাবে এমন বিশ্বাস ও বাউরি সমাজে প্রচলিত। বাউরি সমাজে অনেক রমনীর বিশ্বাস যে মা- বুড়ি কালীর বটগাছের ঝুরিতে ইঁট বেঁধে মানত করলে পুত্র সন্তান লাভ হয়। গল্পে এরকম বহু বাউরি সমাজের বিশ্বাস- অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার- কুসংস্কারের চিত্র চিত্রিত।

গল্পে যেমন বাউরি সমাজের বিশ্বাস সংস্কারের দিকটি পাওয়া যায়, তেমনই বাউরি বাউরি সমাজের নৃত্যের সাথে তবলা বাজানোর কথা, ঘেঁটুগান, নানান প্রবাদ, ঘুমপাড়ানি ছড়ার কথাও পাওয়া যায় -

১. ঘেঁটু গান—

"সময়ের আস্তাকনালে
ছমাসের পথ কলের গাড়ি দন্ডে চালালে।
সায়ের আস্তা...
পুল ভেঙে নদীর জলে সায়ের চিৎপটাং
ওগো তোরা ভেসজ্জনের বাজনা বাজা,
ব্যাংক ড্যানা ড্যাং ড্যাং।"[১]

২. "ঈশেন কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা কলারে শুকো
একে ছেলেম তা মুখ দাও গো, সঙ্গে আছে হুঁকো"[২]

৩. ঘুমপাড়ানি ছড়া—

"আয়রে খোকন ঘর আয়,
দুধমাখা ভাত কাকে খায়;
কাজল নাতায় কাজল শুকায় মায়ের চোখের জল,
বুক ভাসিয়ে ক্ষীরের ধারা ঝরছে অবিরল"[৩]

৪. প্রবাদ—

"বড়লোকের বিটি বেটা
গরিবেরও পেটের কাঁটা!
লই নাস্তিকের ঘর
সকালবেলায় দুধ রে,
রোগ বলে ওষুদ রে।"[৪]

৫. "অফলা নারী
আর এঁটো হাঁড়ী
দুই-ই সমান
শেষ আঁস্তাকুড়েই গতি"[৫]

৬. গান—

"কালা বিনে হলাম কাল,
কালোর গুণ আর বলব কত!"[৬]

এই গানটি বাউরি রমণীরা তাদের কাজের তালে তালে গায়। গানের সুরে পরিশ্রমের ভার লাঘব হয়।

গান—

"সে যদি তোমার মা হত,
ধুলা ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত-

তাহলে তো আমার বুকে আসত না
মামা বলে হাসতে না।"[৭]

অন্ত্যজ বাউরি সমাজের বাক্‌কেন্দ্রিক সংস্কৃতি প্রসাধান পরিধান, বাসস্থান, দৈহিক বর্ণনা, ধর্মীয় আচারের পরিচয় এই গল্পে উন্মোচিত। গল্পের গান ও প্রবাদ আপাত দৃষ্টিতে চটুল হলেও গল্পের ভাবসত্যের রূপায়নে অনবদ্য। শেষ গানের মাধ্যমে মাতৃকাঙ্খার জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটেছে। গল্পে ব্যবহৃত গান, প্রবাদ সবই তীক্ষ্ণধী, ঋজু বক্তব্য প্রকাশী। গল্পে বাউরি সমাজ-সংস্কৃতি একটা সামগ্রিক চিত্র আমাদের সামনে খুব স্পষ্ট। এই গল্পে একাধারে যেমন অন্ত্যজ সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে তাদের আর্থসামাজিক, দারিদ্রতার দিকটিও সমাজে তারা কতটা ব্রাত্য -

"ছোটলোকের দল সব, সমাজে আবর্জনার সমিল, গ্রামের একপ্রান্তে আবর্জনার মতই পড়িয়া আছে।"[৮] - তা সুস্পষ্ট।

তারাশঙ্করের 'ডাইনীর বাঁশী' এবং 'ডাইনী'- দুটি গল্পই গ্রামের মানুষদের ডাইনি নিয়ে অন্ধ কুসংস্কারের গল্প। আদিবাসী এবং অন্ত্যজ সমাজের এক বিশেষ অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা ডাইনি প্রথার প্রচলনের কথা সাহিত্যের বিভিন্ন ছোটগল্প, উপন্যাসে পাওয়া যায়। কোনো মানুষের, বাচ্চার, গর্ভবতী নারীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ হিসাবে গ্রামের লোক তাদের মনগড়া কোনো এক বিশেষ নারীকেই চিহ্নিত করে লাঞ্ছিত করার সংস্কার সমাজে আছে।এই বিষয়টিই তারাশঙ্কর অত্যন্ত সুনিপুনভাবে 'ডাইনীর বাঁশি' ও 'ডাইনী' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী বেনে ও ডোম জাতির মেয়ে স্বর্ণ ও সোরধনী। 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পে স্বর্ণের মা-কে ডাইনি অপবাদ দেয় গ্রামের লোক এবং সকলেই ভাবে স্বর্ণের মা যেহেতু ডাইনি ছিল স্বর্ণও ডাইনি। সকলে তার মনের মধ্যে এই অন্ধবিশ্বাসের চারাকে এমনভাবে প্রোথিত করে যে সে নিজেও ক্রমশ অন্ধবিশ্বাসের গভীর অতলে নিমজ্জিত হয় একসময়। এই একই বিষয় ডাইনি গল্পে সোরধনীর ক্ষেত্রেও ঘটে, এবং সেও নিজেকে ডাইনি বলে মনে বিশ্বাস করে নেয়। 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে মানদা গ্রামে প্রচলিত ডাইনি সম্পর্কে বলে -

১. "আমার শ্বশুর বাড়িতে একটা ডাইনী ছিল শুনেছি, সে নাকি সব দেখতে পেতো। মানুষের বুকের ভেতর প্রাণ নড়ছে, শিরার মধ্যে রক্ত চলছে, পোয়াতীর পেটের ভেতর ছেলে, গাছের ফুলের মধ্যে ফল- সব সে দেখতে পেতো।"[৯]

২. "ওদের মতো অনিষ্টকারী পৃথিবীতে নাই। ফলন্ত গাছ, পোয়াতী, শিশুছেলে এদের ওপর রাক্ষুসীদের ভারী লোভ। মানুষের শরীরের রক্ত চুষে খেয়ে নেয়।"[১০]

৩. "সে মাগী কত যে অনিষ্ট করেছে তার ঠিক নাই। রাত্রে আবার চিৎকার করতো আর বাট বয়ে বয়ে বেড়াতো। শেষে মলো তো মরবার সময় একটা পোষা বেরালকে বিদ্যে দিয়ে গেল। কিছুদিন পর বেরালটা ডাইনী হয়ে উঠল।"[১১]

অন্ত্যজ সমাজের মানুষই শুধু নয় বরং বলা যেতে পারে প্রায় গ্রামের সকল মানুষেরই যুক্তি-বুদ্ধিহীন অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত। তারা নিজেদের মনগড়া কথাকেও এমন ভাবে সত্যরূপে প্রকাশ করেছে ও বিশ্বাস করেছে, তার কারণে স্বর্ণ, সোরধনীর মতো নারীরাও নিজেদের ডাইনি বলে বিশ্বাস করছে, তারা নিজেদের অস্তিত্বের কথা মনে করেও লজ্জা পাচ্ছে। তাদের প্রতি নিজের মনে ক্রোধ ঘৃণা তৈরি হচ্ছে। মুখার্জী বাড়ির গর্ভবতী বৌয়ের গর্ভপাত, বা টুকু'র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া সব কিছুতেই তারা কোনো অপদেবতা বা স্বর্ণ-কে ডাইনি ভেবে তাকে দোষারোপ করেছে। এই গ্রামের মানুষের কাছে ডাক্তারের কথার থেকে গুণীনের কথায় তারা বেশি বিশ্বাস করে –

"ভাগ্যে খোঁড়া গুনীন ছিল- তাই বাঁচলি।"[১২]

'ডাইনীর বাঁশি'- গল্পে ডাইনির যেন জন্মকথা তারাশঙ্কর বলেছেন, তেমনই 'ডাইনী' গল্পে সোরধনীর মৃত্যু যেন তারই অন্তিম পরিণতি। এই গল্পে ছাতিফাটা মাঠ নিয়েও গ্রামের নিরক্ষর চাষীরা বলে- অতীতে কোনো এক মহানাগ এসে এই মাঠে বাস করত, তারই বিষের জ্বালায় মাঠখানার রসময়ী রূপ, বীজ প্রসবিনী শক্তি পুড়ে ক্ষার হয়ে গিয়ে, মাঠটি অভিশপ্ত ও বিষজর্জর হয়ে গেছে। মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাস, ধারনা কিভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে তা গল্পগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট।

গল্পে দেখি সোরাধনী জাতিতে ডোম, তার স্বামীও জাতে ডোম। ডোম জাতের মানুষ যে সমাজে পতিত তা গল্পে পরিস্ফুট যখন সোরধনীর স্বামী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সময় বলে সে জাতে পতিত বলে তাকে কেউ বিয়ে দেয় না। এখানে ডোম জাতির সামাজিক অবস্থানের চিত্র সুস্পষ্ট। সোররধনীও স্বর্ণের মতো গ্রামের সকলের কথা শুনতে শুনতে মনে মনে বিশ্বাস করে সে ডাইনি এবং সে বাকুলের মা তারার কাছে তাকে ডাইনি থেকে মানুষ করে দেবার মানত করতে থাকে, নিজের বুক চিরে রক্ত দেবার কথা বলে। পূজায় বুক চিরে রক্ত দেওয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিজের মনস্কামনা পূর্ণের উদ্দেশ্যে এবং পশুবলি এগুলো প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সংস্কৃতিতে চলে আসছে। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পে পাওয়া যায়।

সরকার বাড়ির ছেলে আম মুড়ি খেয়ে অসুস্থ হলে কিংবা সাবিত্রীর ছেলে অসুস্থ হলে, এক অচেনা তরুনীর ছেলে রোদে মারা যাওয়ায় কিংবা এক যুবক বৃদ্ধ সোরধনীকে দেখে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগায় গ্রামবাসীরা বলে –

"সর্বনাশী ডাইনী বাউরিদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে।"[১৩]

সোরধনীর মনেও ক্রমশ বিশ্বাস জন্মায় এই সবকিছুর জন্য, এমনকী তার নিজের স্বামীর মৃত্যুর জন্যও সে নিজেকে দায়ী করে। গ্রামের এই অন্ত্যজ ডোম, বাউরি এই শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে ধনুষ্টংকার রোগ বা গরমে জলবিয়োজন বা ডিহাইড্রেশন এই সমস্ত জানার কথা নয়। তারা ভেবেই নেয় এই সব ডাইনির কাজ। তাদের বিশ্বাস গুনীনে। হতভাগিনী বৃদ্ধার মৃত্যুর যে করুণ জীবনালেখ্য তারাশঙ্কর রচনা করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে সমাজ মানসের অবচেতন অন্ধকার দিকটি উন্মোচিত।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে সমাজে অন্ত্যজ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কথা পাই। গল্পে এক বিচিত্র সামাজিক বিশ্বাসের পরিচয় লভ্য। গল্পে খোঁড়া শেখ একটি সাপকে তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে তাকে একটি নাকফুল পরিয়ে দেয়। মুসলমান সমাজে বিবাহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আচার-বিবাহিত মহিলাকে নাকের পরতে হয়। এছাড়ও সে সাপটিকে হিন্দু বিবাহ রীতিতে যেরকম বিবাহের বর কনেকে সিঁদুর পরায়, তেমনই খোঁড়াও তার বিধি নামক সাপটিকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। গল্পের নায়ক খোঁড়া শেখের গলায় একটি গান পাওয়া যায় তার আদরের সাপিনীকে নিয়ে-

"জানি না গো এমন যে হবে
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরাতে যাবে
ও জানি না গো"[১৪]

এই গল্পে পান্তাভাত, গাঁজা নিম্নমানের খাদ্য খাওয়ার কথাও পাওয়া যায়। এই গল্পে খাদ্যাভাসের পাশাপাশি এক ভ্রান্ত ধারনার কথাও পাওয়া যায়। এখানে সাপেকাটা রোগীর লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে মাথায় চুল উঠে আসার মতো ঘটনা। এছাড়া জোবেদাকে সাপে কামড়ানোর পর কোনো ডাক্তার দেখানো কথা পাই না, বরং ওঝাদের কথা পাই। গ্রামের দিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা আগেও এবং বর্তমানেও সাপে কামড়ানোর ক্ষেত্রে ওঝাদের ওপরই নির্ভরশীল। গল্পে অন্ত্যজ সংস্কার, মনের ভাবনা, বাক্ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাস ও বিশ্বাসের চিত্র পরিস্ফুট।

'বেদেনী' গল্পে শম্ভু বাজিকর, রাধিকা এই দুই চরিত্রই বেদে জাতি নিয়ে। গল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেদে জাতির যাযাবর জীবন-জীবিকা, পোশাক, তাদের দৈহিক রূপবর্ণন, দাম্পত্য, পরকীয়া, হিংস্রতা, ক্রুড়তা ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস সবকিছুর এক সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

গল্পের প্রথমেই বেদে জাতির জীবিকার কথা উঠে এসেছে, তারা বাঘ নিয়ে গ্রামের মেলায় সার্কাস দেখায়। এছাড়া সার্কাসের বাইরে রাধিকা বেদেনী ছাগল, বাঁদর ও সাপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জনের রাস্তাকে বেছে নিয়েছে। এছাড়া রাধিকার প্রথম স্বামী শিবপদ বেদে হলেও সে আবার জীবিকা হিসাবে এসব কিছু বেছে নেয়নি, বরং -

"সে করিত বেতের কাজ, ধামা বুনিত, চেয়ার পালকির ছাউনি করিত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ারি করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি।"[১৫]

এছাড়া রাধিকা যখন সাপের খেলা দেখাত শিবপদ বাঁশি বাজাত। লেখক বেদিয়া জাতির নানান বৈচিত্র্যমন্ডিত পেশার কথা চিত্রিত করেছেন।

'বেদেনী' গল্পে বেদেজাতের মেয়েদের জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্যের কথাও পা ওয়া যায়-

"কালো সাপিনীর মত ক্ষীনতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার মত সিঁথিতে তাঁহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে টানা অর্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই একটা ধরাইয়া দেয় নেশা।"[১৬]

একটা জাতির রূপবৈশিষ্ট্য তার নিজস্বতা বা তার সংস্কৃতি অঙ্গ। বেদে জাতির মদ চুরি করার অভ্যাস যা বলা যেতে পারে কালের নিয়মে এও যেন তাদের এক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেদিয়া বা বেদে জাতির ধর্মাচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস আচার রীতি, পূজার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত নতুন তথ্য সম্পর্কে অবগত হই এই গল্পে। বেদেরা জাতিতে বেদে, অথচ তারা ধর্মে ইসলাম। তারা নামাজ পড়ে , আবার আচার-রীতি- নীতিতে হিন্দুদের ন্যায় মনসা পুজো করে, মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত পালন করে, কালী দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। সন্তান হলে কালী দুর্গা হিন্দু দেবদেবীর নামে নাম রাখে। হিন্দু পুরাণ কথা তাদের মুখস্থ। বিবাহের ক্ষেত্রেও এদের নিয়ম ভিন্ন, এরা না হিন্দু ধর্মালম্বীকে বিশ্বাস করে , না মুসলমানকে। তারা নিজের জাতের মধ্যেই বিয়ে করে কিন্তু ইসলামীয় পদ্ধতিতে। মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রেও তারা মৃতদেহ কবর দেয়। বেদিয়ার সামগ্রিক পরিচয়ের পাশাপাশি গল্পে পটুয়া সম্প্রদায়ের কথাও বলেছেন, যারা হিন্দু পৌরাণিক গান করে ও পট আঁকে।

বেদিয়া জাতির পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি চিত্র লেখক সূক্ষভাবে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। খাদ্যাভাসের অল্প কথাও পাওয়া যায়, তারা মদের সাথে পাখির মাংস, মুড়ি এসব খায়। গল্পে বেদেনী নারীর দাম্পত্য পরকীয়া, জৈবিক কামনা-বাসনার কথা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। লোক-লৌকিকতা, নিয়ম- নীতিকে তোয়াক্কা না করে সাংসারিক সমস্ত বন্ধনকে পদদলিত করে নিজের প্রকৃতিজাত কামনা পূরণের চেষ্টা করেছে সর্বদা। সে প্রথমে শিবপদকে ছেড়ে শম্ভুর কাছে এসেছে এবং পরে শম্ভুকে ছেড়ে কিষ্টোর কাছে গেছে। কামনা বাসনা রহস্যময়তা, দেহ কামনার উগ্রতা, এই আদিম প্রবৃত্তি এই আদিবাসী রমণী রাধিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ফুটে উঠেছে। বেদিয়ারা আসলে যাযাবর হয়, তার সেই যাযাবর সংস্কৃতিই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে।

বেদিয়াদের নিয়ে লেখা 'বেদেরমেয়ে' গল্পেও লেখক আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেদিয়া জাতি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে গল্পের ছলে। যা থেকে এই জাতির সংস্কার- সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক একটা ধারণা পাওয়া যায় । বেদিয়ারা যে যাযাবর তাদের চুরি করা স্বভাব এটা স্পষ্ট -

"বাস্ তারপরই আরম্ভ হল তাদের রক্তের খেলা, বল- রক্তের খেলা, অভ্যাসের ধর্মও বল, তাই। চুরি আরম্ভ হল।"[১৭]

বেদেদের রক্তে যেমন চুরি করা লেখা, আর জেলে যাওয়াও যেন তাদের ক্রমাগত সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেদে জাতির মেয়েরা বিচিত্র চরিত্রের ও পুরুষদের ন্যায় স্বতন্ত্র। তারা অর্থাভাবে দেহ ব্যবসা করে। এছাড়া গল্পে আমরা বারবার উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সামাজিক বৈষম্যের কথা পাই। এই বেদিয়া যাযাবর জাতির মানুষগুলো গল্পে দেখি হিন্দু গ্রামে থাকতে থাকতে তারা তাদের নিজের ভাষা, রীতি-নীতি ভুলে গেছে এবং হিন্দু ধর্মের রীতি নীতিকে আপন করেছে। গল্পের এই কথা বাস্তবেও সত্য। বর্তমানেও আদিবাসীরা অনেকাংশেই তাদের নিজস্ব সংস্কার-সংস্কৃতি ভুলে অন্য ধর্মের রীতিনীতি সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে।

তারাশঙ্করের 'বাউল' গল্পে বাউল নিজে গুণীন। সর্পাঘাতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের চিকিৎসা ডাক্তার করে না, মন্ত্র তন্ত্র, তুকতাক- ঝাড়ফুঁকে হয়।গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণীর অগাধ আস্থা ঝাড়ফুঁকে। গল্পে এই ঝাড়ফুঁকে নানাবিধ সব ক্রিয়কর্মের প্রকাশ রয়েছে- সেখানে মন্ত্রের মাধ্যমে সাপকে এনে সাপকে দিয়ে বিষ তোলানো হয়। কাঁচা দুধ লাগে এই ঝাড়ফুঁকে। শুধুমাত্র ঝাড়ফুঁক করেই নয়, এর সাথে শিকড় বাকড়ের ওষুধের বিধানও দেওয়া হয়।

"তারপর একটা শিকড় বাহির করিয়া নবীনের হাতে দিয়া বাউল কহিল- জল ঢালুন খুকীর মাথায়। জ্ঞান হবে। জ্ঞান হলে এই শিকড়টি গোলমরীচের সঙ্গে খাইয়ে দেন। তিনটি গোলমরীচ।"[১৮]

যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক শিক্ষিত মনন এই সমস্ত সংস্কার না মানলেও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা আজও প্রাচীন কাল থেকে এই অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত।

এই গল্পে গৃহবিবাগী বাউলের কণ্ঠে কিছু গান অন্ত্যজ বাউল সম্প্রদায়ের বাক্‌কেন্দ্রিক সংস্কৃতির উপাদানকে উন্মোচিত করে। গল্পে বর্ণিত বাঁশের আঁকাবাঁকা বিচিত্র গঠন নল, একতারা, নূপুরের এই সবকিছুই তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

১. "সাধে কী তোর গোলাপ চাই গো
শোন যশোদা
তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে-
বনে অন্ন পাই গো শোন যশোদে!"[১৯]
২. "ভালো করে পড়্‌গা ইস্কুলে
নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।
বড় ইস্কুল জেলা নদীয়া,
হেডমাস্টার দয়াল নিতাই কেলাসে দেয় তুলে।"[২০]
৩. "মাটিতে চাঁদের উদয় দেখবি আ-য়
যুগল চাঁদ কেউ দেখিসনি, দেখতে নদীয়ায়।"[২১]

গানগুলি বাউলের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা। আকাঙ্ক্ষার সুরের পাশাপাশি পরবর্তী বাউলের জীবনের পরিনতিই পরিস্ফুট। গল্পের এই গানগুলি এবং আগে আলোচিত সংস্কার-বিশ্বাস অন্ত্যজ জীবনের সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে।

তারাশঙ্করের অন্য আরেকটি গল্প 'চোর'। সেখানে ডোম সমাজের কথা বর্ণিত। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী ডোম। গল্পে তাদের 'পাকা চোর', বংশানুক্রমিক চোরের বংশ' বলা হয়েছে। গল্পের এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অন্ত্যজ মানুষগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের সামাজিক অবস্থান চিত্র ফুটে ওঠে। ডোম জাতির, বেদে জাতির পরিচয় উচ্চ বর্ণের মানুষের কাছে তারা চোর। বিভিন্ন গল্পে এই বিষয়টি পাওয়া যায় এটা সুস্পষ্ট।

এই গল্পে বিশেষ বিশ্বাসের সামাজিক প্রথার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। বি-এল. কেসে ডোম পুরুষদের জেল হলে, তাদের একেবারে নিজস্ব এক প্রথা- বিদায় ভোজের আয়োজন করা হয়-

"এত দুর্দশার মধ্যেও গত রাত্রে খাসী কাটিয়া মাংস রান্না হইয়াছিল। বিদায় ভোজ জাতীয় ব্যাপার।"[২২]

এই প্রথা তাদের তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে। বাসী মাংস-ভাত এবং পান খেয়ে তারা জেলে আত্মসমর্পণ করতে যায়। গল্পে ডোম সমাজের বৈচিত্র্যমন্ডিত আচার বিশ্বাসের জীবন্ত ছবি উদ্ভাসিত।

'বরমলাগের মাঠ' গল্প বাউরি সমাজের কিছু আচার-বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের চিত্র প্রতিফলিত। গল্পে বাউরি সমাজের নানান বিশ্বাস কুসংস্কারের কথা উঠে এসেছে -

১. "বরমলাগের মাঠ, লাগের বিষে হোথা ঘাস গজাত না, ধুধু করত।"[২৩]

২. "এক বেদের মেয়ের সঙ্গে জোয়ান বয়সে হয়েছিল ভালোবাসা। সেই দিয়েছিল তাকে বাউরির বিদ্যে।"[২৪]

৩. "নটবরকে মন্তর শিখিয়েছিল, বিদ্যা দিয়েছিল কিন্তু সব দেয় দেয় নাই, পাছে তার মন্তরের মায়া কেটে সে পালায়, তাই দেয় নাই। পালালে নটবরে মেরে ফেলত বাণ মেরে কি নাগ ছেড়ে দিয়ে। যেখানে থাকো না কেন; সে নাগ তাকে না মেরে ছাড়ত না।"[২৫]

৪. "সে গাঁয়ের লোককে বললে, বরমলাগ শিরে গলার পৈতে, লাগের নিশ্বেস প'ড়ে শিবের নাকে যায়, তাতেই বাবার চোখ হরদম ঢুলুঢুলু।" [২৬]

৫. "লোকে বলে ডাকিনি বাউরির চোখের জলের নুন বরমলাগের মাঠে আজও জমে আছে।"[২৭]

৬. "নাগকেও বধ করতে হয়। তার বদলে মা মনসার পুজো দেয় চাষী, ভগবানকে সাক্ষী রাখে। তবে নাগ যদি বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবেই সর্বনাশ। ডাকিনী বাউরির বুকে নাগ জেগে উঠেছিল। নাগ নিজের মৃত্যুর শোধ নিয়েছিল, ছাড়ে নাই।"[২৮]

গল্পে এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায় বাউরি সমাজের অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার-ধ্যানধারণার বেদেনীরা বিভিন্ন মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাকে পারদর্শী একথা সমাজের অন্যজাতের মানুষেরা বিশ্বাস করে। এ সবই তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ৬ তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। বাউরিরা ব্রহ্মনাগ বা বরমলাগকে দেবতা বলে মনে করে এবং সেই সাপ যে অব্যর্থ শক্তির অধিকারী এত

তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। পরিবার ক্রমে শুনে আসা ঘটনাগুলি বাউরি সমাজের মানুষের মনে এমনভাবে গেঁথে গেছে তা একেবারে কুসংস্কারের মহীরূহে পরিণত হয়েছে। গল্পে আদিবাসী মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন বর্ণনা পাওয়া যায়।

বাউরি সমাজে রক্ষণশীলতা ও জাত-পাত বিষয়ে প্রকটতার ছবিও গল্পে পাওয়া যায়। গল্পে দেখি নটবর বেদের মেয়ের সঙ্গে পনেরো বছর একসঙ্গে থাকায় তাকে একঘরে হতে হয়েছিল। এছাড়া গল্পে বাউরি সমাজের সামাজিক অবস্থান চিত্রও খুব স্পষ্ট যখন বলরামের মেয়ে নিজেদের 'ছোটনোক' বলে। তারা যে শিক্ষিত নয় একথাও গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথের কথায় স্পষ্ট-

> "জীবনে স্বভাব ছাড়া শিক্ষা দীক্ষা নাই"[২৯]

বাউরি সমাজের এমন বিশ্বাস-আচার-প্রথা চিত্রণে অন্ত্যজ শ্রেণীর সামাজিক এক তাদের সংস্কার-সংস্কৃতির দিকটি উন্মোচিত।

'সাপুড়ের গল্প' গল্পটিতে সাপুড়েদের জীবনচর্চায় কিছু চিত্র চিত্রিত –

> "তাদের স্বভাব দৈহিক রূপের বর্ণনা, তাদের রীতিনীতি, প্রথা-সংস্কার-সংস্কৃতি, বিশ্বাসের উল্লেখ পাই। বেদিয়া জাতির মানুষেরা গাঁজা, সাপের বিষের নেশা করে। তাদের বাসস্থান খাল-বিলের কাছে, পতিত প্রান্তরের সেই অরণ্যযুগের ঘর-দুয়ারে বাস করে; খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, নাচ-গান, ভিতর বাহির দেহমনও তাই, সেই আদিম এবং অরণ্য।"[৩০]

লেখক এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেদিয়া জাতির বাসস্থান, মননের হদিশ দিয়েছেন। এই বেদিয়ারা ভিক্ষা করে, সাপের খেলা দেখিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের গায়ের রঙ কালো, ঘন করকরে তাদের চুল। কালো সাপের মতো তাদের নাক মুখ চোখের গঠন। বেদিয়ারা সমাজের চোখে অন্য ধরনের এক আশ্চর্য বলা যায়। তারা সাহসী, হিংস্র, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী, প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। এ ছাড়াও বেদিয়া জাতির কয়েকটা কুসংস্কারের, প্রথার-রীতির কথা গল্পে বর্ণিত -

> ১. "মিঠাই পেলে ভাগ দিব, মদের চেয়ো না। তারপরেই হাতের বিষম চাকিতে ঘা মেরে হাঁক দেয়- সাপার নাচন। সাপার মাথায় আঁটুলি। মাদুলি করে হাতে বাঁধলে রাজা হয়। লিবাগ?"[৩১]
>
> ২. "শিয়াল ডাকিলে পরে- বেদেরা লিবে না ঘরে।"[৩২]

এর পাশাপাশি বেদিয়ারা যাযাবর শ্রেণীর এবং তারা ঝাড়ফুঁকে, মন্ত্রে বিশ্বাসী। বেদিয়ারমণীরা বহু পুরুষগামী হিসাবে বিভিন্ন গল্পে চিত্রিত। তাদের সংস্কৃতিতে বহু বিবাহ প্রথার চল ছিল একথা স্পষ্ট।

'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে বেদিয়া জাতি ও অন্ত্যজ সমাজে প্রচলিত কিছু ধ্যান ধারনার চিত্র আভাসিত। গল্পে বাণ মারা, বাণ মেরে খোঁড়া করে দেওয়া, কাউরের বিদ্যা, ডাকিনী নিয়ে নানান গল্প, লোখকথা পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে গাছের উপরে লোক বসে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, লোকে বিদ্যার জোরে মানুষকে জ্যান্ত বানানো এই সমস্ত লোককথা অন্ত্যজ সমাজে প্রচলিত। বেদেনী বলে ডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে সর্পাঘাতের রুগীর চিকিৎসা করে কিন্তু কোবরেজরা সাপের বিষ দিয়ে ওষুধ তৈরি করে। সর্পাঘাতের রোগীর চিকিৎসা করে। এছাড়া বেদিয়া জাতির মৌমাছি, কালকেউটে সাপ, বোলতা কাঠপিপড়ে নিয়ে 'তুমড়ি খেলা'র প্রথার চিত্র পাওয়া যায়।

বেদেনীর গলায় আদিবাসী গান অর্থাৎ তাদের বাক্ কেন্দ্রিক সংস্কৃতির চিত্র ফুটে ওঠে-

> "যেমন গিন্নি চাঁদবদনী তেমনি শাড়ি লিব গো!
> ও কালাদহে ঝাঁপ দিল কে?
> সাজ সাজ নাগিনী লো, খোল বিষের চাবি-
> মাথায় মানিক পরি কেশ বান্ধিলে
> ও নাগিনী, কালিদহে ঝম্প দিল কে?"[৩৩]

এছাড়াও সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের হাতে বেদেনীর নিগ্রহের চিত্রও সুস্পষ্ট গল্পে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলতেও সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষরা দ্বিধা বোধ করে না। 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে যেমন

আদিম লোককথা, আদিবাসী জনজীবনের বিশ্বাস সংস্কার- সংস্কৃতির পরিচয় পাই, তেমনই তাদের আর্থসামাজিক দিকটিও স্পষ্ট।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাটনী' গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী চন্ডালদের এক সামাজিক প্রথা বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ। গল্পে আদিম প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনচর্চার বর্ণনা। চন্ডাল জাতির উপকথা পাই, যেখানে কল্পনার বৈচিত্র্য মানুষ বিশ্বাসী, বাস্তবতার বালাই নেই। চন্ডাল সমাজের এক সামাজিক প্রথা- শ্মশানে দন্ডধারী হওয়ার প্রথা। এক দন্ডধারী মারা গেলে তার নিভে যাওয়া চিতা থেকে আধপোড়া কাঠ নিয়ে স্নান করে নতুন কেউ দন্ড ধরবে।

প্রথম দন্ডধারী মারা যাবার পর হবু দন্ডধারীকে লুকিয়ে থাকতে হবে, লুকিয়ে এক জায়গায় কাঁদতে হবে এবং তারপরে এসে শ্মশানে দন্ড ধরবে। এ ছাড়াও চন্ডাল জাতির জীবনচর্চার কিছু কিছু চিত্র গল্পে আভাসিত -

> "হরেক রকম দামী ছিটের বালিশও দেখতে পাবে, চারাদিকে ছড়ানো দেখবে তুলো, ছেঁড়া তোষকে টুকরো দেখবে গাদা হয়ে আছে একদিকে, একদিকে দেখবে গাদা হয়ে আছে পোড়া কাঠ।"[৩৪]

চন্ডালেরা যে শবযাত্রীর পোশাক, বিছানা, চিতার কাঠ নিজেদের বাড়িতে আনে তার বর্ণনাই পাওয়া যায়।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে বাগদী সমাজের, বাগদী জাতের জীবিকা, তাদের আদি গৌরব-সংস্কৃতির কথা লিপিবদ্ধ। বাগদীরা হিংস্র দুর্ধর্ষ জাতি, আদিতে নবাবের পল্টন ছিল- তাদের পুরুষেরা মানুষ খুন করত, তারা সেই লাশের ব্যবস্থা করত। এ ছাড়াও গল্পে দেখি বাগদীরাও তাদের জাত নিয়ে বেশ সচেতন -

> "আমার ননদ নীচ জাতের সঙ্গে বেড়িয়ে গিয়েছিল, সেই নিয়ে কুলের খোঁটা।"[৩৫]

এছাড়াও গল্পে তাদের 'ঘাঁটি খেলা' নামক একরকম খেলার কথা জানা যায়। বাগদীদের গায়ের রঙ ছিল অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। গল্পে বাগদী সমাজের আদিম বর্বর সংস্কৃতির চিত্র ধরা পড়েছে।

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যজ ও আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্পগুলি বিশ্লেষণে বহু বৈচিত্র্য মন্ডিত সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনের বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে তার সামাজিক আচার- সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথা সর্বোপরি তাদের সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে। উপরিউক্ত গল্পগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় লোক সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত। ভারতীয় মানব সমাজের আদি স্তর যারা তারাই উচ্চবর্গীয় সমাজ বন্ধনের কাছে অবহেলিত, অবজ্ঞাত; সমাজের একপ্রান্তে আবর্জনার মতো পড়ে থাকে। গল্পগুলির বহুমাত্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় এই অন্ত্যজ আদিবাসী যারা- বাগদী, ডোম, সাঁওতাল, বেদিয়া, চন্ডাল, বাজিকর, তাদের বাসস্থান গ্রামের প্রান্তে ঝুপড়ির মতো, খাদ্য অত্যন্ত নিম্নমানের, অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে। পরিধান নোংরা শতচ্ছিন্ন। দারিদ্রতার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম। বহু শতাব্দী প্রাচীন হাজারো আচার সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসে বাঁধা তাদের লাঞ্ছিত জীবন। শিক্ষার আলোকহীন যুক্তি বুদ্ধির তোয়াক্কা না করা আধা ভৌতিক, অলৌকিক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারে মগ্ন এই অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষগুলোর জীবন। গল্প পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে গ্রামের অন্ত্যজ, আদিবাসী জীবনের ধর্মীয় সংস্কার, বাক্ কেন্দ্রিক - বস্তু কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং এর পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান চিত্রের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৮
২. পূর্বোক্ত
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০
১১. পূর্বোক্ত
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
১৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৫২
১৪. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৭০
১৫. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৩৮
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫
১৭. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - তৃতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮৭
১৮. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৮
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮
২৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - তৃতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৭৯
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯
২৮. পূর্বোক্ত
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০
৩১. পূর্বোক্ত,
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৪
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৩৫. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৯১

গ্রন্থপঞ্জী :

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৫, জুলাই (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০০৯
২. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ। ১৯৭৬, এপ্রিল (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০০৯
৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - তৃতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৭, সেপ্টেম্বর (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০০৯
৪. মুরশিদ, গোলাম, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, জানুয়ার্ ২০০৬, ঢাকা, ১১০০